দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...21 AUG 1988...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 3 ...

036

প্রিয় অপ্রিয়

সত্যদর্শী

মাস খানেক হয় দেশের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। ভেবেছিলাম এবার পরীক্ষা নিয়ে আর কিছু লিখবো না। প্রতি বছরের মতো এবারও পরীক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে। তর্ক-বিতর্কও কম হয়নি। এরপর আর কিছু লেখার বিশেষ কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ও পরীক্ষা নিয়েই যেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দু'-তিন সপ্তাহ যেতে না যেতেই শোনা গেলো, অষ্টম শ্রেণী থেকে নাকি নতুন পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা হচ্ছে। এর মধ্যে পাঠ্যসূচীতে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সম্প্রতি জানা গেলো, ১৯৮৯ সালের এস এস সি পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ে আকস্মিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পরীক্ষার আর মাত্র সাত-আট মাস বাকি। এর মধ্যে নতুন পরিবর্তন পরীক্ষার্থীদের জন্য সমস্যার কারণ হবে কিনা তাও ভেবে দেখা হয়নি। আসলে শিক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোনো কিছু করার আগে কখনোই সবদিক ভালোভাবে ভেবে দেখা হয় না। প্রায়শই এক ধরনের নতুন কিছু করার উত্তেজনায় ও সংস্কার সাধনের উচ্ছ্বাসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হয় কিনা তাও লক্ষ্য করার বিষয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই সবকিছু ঢেলে সাজানোর একটি মুখস্থ বুলি আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের বিবেচনাবোধ ও বিচারবুদ্ধিকে যে কিছুটা হলেও আচ্ছন্ন করে, তাও বোধ করি একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই। সেজন্যেই সব কিছু করার আগেই তার মধ্যে কেবল নব নব সম্ভাবনার ঝিলিক দেখতে পান। কোনো সমস্যা বা সংকটের ছিটেফোঁটাও চোখে পড়ে না। এমনকি শিক্ষা বা পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও এই ধরনের অপরিণামদর্শী ও হঠকারী সিদ্ধান্ত দ্বারা কম বিভ্রান্ত ও সমস্যা-পীড়িত হয়নি। মূলত সেজন্যেই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার এতোদিন পরেও আবার সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে হচ্ছে।

ঘাঁটতে যখন হচ্ছেই তখন কিছুটা গোড়া থেকেই শুরু করি। এবার এস এস সি পরীক্ষার ফল মোটামুটি ভালো। অনেকেরই অন্তত তাই মত। আমি অবশ্য তা মনে করিনে। মনে করিনে তার কারণ, তাহলে ৪৫ শতাংশ অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর কথা ভুলে যেতে হয়। খবরের কাগজের হেডিং-এ পাসের হারই উল্লেখ থাকে, ফেলের নয়। সেজন্য আমাদের চোখটাও পড়ে ঐ পাসের দিকেই। মানুষ স্বভাবতই জয়ের কথাই শুনতে চায়। আনন্দের কথাই জানতে চায়। নিষ্ফল, ব্যর্থ ও অকৃতকার্য যারা তাদের খবর চাপা পড়ে যায় জয়, সাফল্য ও সার্থকতার আনন্দের নিচে। কর্ণ যে মায়ের স্নেহের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলো—'আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে' তা কারোর মনেই বড়ো বেশি আবেদন জাগায় না। বিজয়ী, সফল ও কীর্তিমানেরাই পায় খ্যাতি, যশ ও স্বীকৃতির গৌরব, সম্মানের মালা; ব্যর্থ, বঞ্চিত ও পরাজিতদের জন্য গোপন অশ্রুও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। এটাই সংসারের রীতি, বিশেষত যে সমাজ-সংসারের নীতিই হচ্ছে বাণিজ্য—যেখানে 'প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই।' হোক না সে জয় নীতিবিরুদ্ধ, হোক না সে কীর্তি অন্যায়ের পথে অর্জিত। স্থবির, বন্ধ্যা সমাজে তারই জয়গান, তারই প্রশস্তি। ব্যর্থতাও যে কখনো কখনো সাফল্যের চেয়ে মহৎ,' পরাজয়ও যে কখনো কখনো জয়ের চেয়ে মূল্যবান, সেই পবিত্র ব্যর্থতা কিম্বা মহৎ পরাজয় উপলব্ধি করার মতো সংবেদনশীল হৃদয় এখানে কোথায়? সত্যের চেয়ে মিথ্যা, সততার চেয়ে অন্যায় যেখানে প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি পাচ্ছে সেখানে সক্রেটিসের সেই উক্তি 'মরতে যখন হবেই তখন অপরাধ না করে মরাই তো ভালো' কি কোনো মর্যাদা পাবে? পাস করেছে অনেক ছেলে-মেয়ে সে খবরটা ভালো; কিন্তু ফেলও করেছে অনেক ছেলেমেয়ে, সে খবরটি দুঃখের। আর তাদের সংখ্যাও দুঃখজনকভাবে অনেক। ফল প্রকাশের দিন রাজধানীর মিষ্টির দোকানগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই খালি হয়ে গেছে একথা যেমন সত্য, তেমনি একই দিনে পরীক্ষায় পাস করতে না পেরে কোনো শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে একথাও কিন্তু সমান সত্য। কিন্তু দোষ কি ঐ হতভাগ্য তরুণের, না দোষ গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ও সার্বিকভাবে এই সমাজের? ইচ্ছে করছে ১৯৮৩ সালের ২৭শে জুনের 'পাস ও ফেল, দায়ী কে?' শীর্ষক আমাদের একটি সম্পাদকীয় এখানে তুলে ধরি। সম্পাদকীয়টি দীর্ঘ। সেখানে স্পষ্টই বলা হয়েছিলো, কেবল তরুণ শিক্ষার্থীরাই ফেল করেনি, ফেল করেছে গোটা সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হচ্ছে আমরা কেউই তা ভেবে দেখিনে। কখনোই কি ফেলকরা দশজন ছাত্র-ছাত্রীর সাক্ষাৎকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে? না, তাদের কথা জানার কোনো আগ্রহ হয়নি আমাদের। গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা-পদ্ধতি যেখানে নানা অসদাচরণ ও দুর্নীতির শিকার, যেখানে পরীক্ষা ও ফলাফল বারেবারে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি, প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্যায় গ্রীবা যেখানে শিক্ষা বা পরীক্ষার মতো পবিত্র ক্ষেত্রটিকেও আক্রান্ত করেছে বলে শোনা যায়, সেখানে অনুত্তীর্ণদেরইবা মেধা-বিচারে খারিজ করা যাবে কিভাবে? যতো অনিয়ম, যতো অসদাচরণ, যতো অন্যায়ই থাকুক না কেন, যারা পাস করে তারাই পায় যোগ্যতার স্বীকৃতি অর্থাৎ পাস করতে পারলেই হলো। জ্ঞান মুখ্য নয়, বিদ্যা মুখ্য নয়, পাসই মুখ্য। এই অবস্থা ও এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পাসের একখানি সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্য যে প্রাণান্তকর প্রয়াস চলবে, সে আর বিচিত্র কি! পরীক্ষাই কারো মেধা বা যোগ্যতা যাচাইয়ের একমাত্র মাধ্যম নয়। সেন্ট অগাষ্টিন যে বলেছিলেন, 'ইফ নট আস্কড আই নো, ইফ ইউ আস্ক মি আই নো নট' তা শিক্ষা বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের স্মরণ করিয়ে দিতে যাওয়া অর্থহীন। তাঁরা বলবেন, তাহলে কি পরীক্ষা থাকবে না?

থাকবে না কেন, একশো বার থাকবে। কোন্ দেশেইবা পরীক্ষা নেই? কিন্তু এই সঙ্গে কর্তাব্যক্তিদের কি সবিনয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি কোন্ দেশে জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় এভাবে গণ্ডায় গণ্ডায় ফেল করে, তরুণ শিক্ষার্থীরা বাবা-মা ও পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়? সমাজে ও পরিবারে তাদের যে আর কোনো মূল্যই থাকে না, তাও কি তাঁরা একবার ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেছেন? ফেল করা ছেলেরা অপগণ্ড, আকাট-অপদার্থ। বিশ্ব সংসারে তাদের দিয়ে আর কিছু হবে এমন ধারণা যেমন তাদের পরিবারের লোকজনেরা পোষণ করে না, তেমনি পোষণ করে না সমাজের অন্য দশজনে। ফলে, পরীক্ষায় ফেল করা এইসব তরুণ ছেলে-মেয়ের জীবন অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় ও তুচ্ছ হয়ে পড়ে। তারা দেখতে পায় সমাজে ও পরিবারে তারা উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত। যে দেশে শিক্ষিতের হার এখন পর্যন্ত সরকারী হিসেবেই শতকরা ২২ জন, সেদেশে এটি কি ধরনের পরীক্ষা? চীনে এক সময় পরীক্ষা শেষ করতে সময় লাগতো আশি বছরেরও বেশী। পরীক্ষা দিতে দিতেই অনেকের জীবন কেটে যেতো। অনেকে মৃত্যুর আগে পরীক্ষার সুযোগই পেতো না। এই মাত্র সেদিনের কথা, কোরিয়ার একজন তরুণী সেখানকার জটিল পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রতিবাদে উঁচু দালান থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো। আত্মহত্যার আগে জানিয়েছিলো, সে পরীক্ষা-মুক্ত দেশে চলে যেতে চায়। আমরা নিশ্চয়ই শিক্ষাব্যবস্থার নামে এমন কোনো পরীক্ষা পদ্ধতি চাইনে। প্রতি বছর এই যে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ফেল করে, এদের ভবিষ্যতের কথা কি কখনোই ভেবে দেখা হয়েছে? এদের কতো ভাগ ছাত্র-ছাত্রী আবার নতুন উদ্যমে পড়াশোনার সুযোগ পায়? এই শিক্ষায় অনগ্রসর দরিদ্র দেশে দশ-বারো বছর (আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই কয়েক ধাপ পেরিয়ে তবে প্রথম শ্রেণীতে উঠতে হয়) লেখাপড়া করে যদি প্রতি বছর এভাবে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে মেধা নির্বাচনের যোগ্যতায় অকৃতকার্য হয়ে শিক্ষাজীবন তথা সমাজ জীবন থেকেই ছিটকে পড়তে হয়, তাহলে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি বা শিক্ষার প্রসার ঘটবে কিভাবে? শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চয়ই পরীক্ষার কড়াকড়ি দ্বারা যে সম্ভব নয় তা বোধকরি অধিক ব্যাখ্যা না করলেও চলে। আজকাল ইংরেজীর কথাও বেশ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু মাথা রেখে লেজ ধরে টেনে কি কিছু লাভ হবে? শিক্ষার উন্নতি কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়। এর জন্য সার্বিক অবস্থার উন্নতি প্রয়োজন।

মনে হয় আমাদের শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনেকে এতো কিছু ভাবনা-চিন্তার তেমন প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁরা শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর যখন-তখন খেয়াল-খুশিমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা ধরনের মহড়া চালানোই বোধ করি অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করে থাকেন। সে জন্যেই মনে হয় পাঠ্যসূচীতে এমন জটিলতা, পাঠ্য-বইয়ের ভারে শিক্ষাজীবন এভাবে ন্যুব্জ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এমন বিভ্রান্তি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিরাট বৈষম্য। শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্তাব্যক্তিরা এসব বিষয় উপেক্ষা করে যদি ফেলের সব দায়িত্ব কেবল তরুণ শিক্ষার্থীদের কাঁধে চাপিয়ে অব্যাহতি পেতে চান, তাহলে সে আলাদা কথা। কিন্তু প্রতি বছর দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পরীক্ষায় পাস-ফেলের যে করুণ চিত্র ফুটে ওঠে তাতে গোটা সমাজব্যবস্থার ক্ষতটাই যে আরো প্রকট হয়ে দেখা দেয় তা বোধ করি স্বীকার করাই ভালো। এ সমাজে কিছুসংখ্যক লোক সব ক্ষেত্রেই পাস করছে, করছে পরীক্ষাতেও, কিসের জোরে পাস করছে সে তর্কে নাইবা গেলাম। আর সৎ ও মেধাবী দু-চারজন যারা পাস করছে তারা পাস করেও ঠাঁই পাচ্ছে না কোথাও। এক-সময় গ্রামের স্কুলগুলো থেকেও ভালো ফল হতো। এখন মেধা তালিকা থেকে গ্রাম প্রায় নির্বাসিত। অবার গ্রামের তুলনায় নগরীর পরীক্ষার্থীদের পাসের হার কম। এ ক্ষেত্রে নগরীর বাইরের পরীক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে শোনা যায় নানা অভিযোগ। শহরে থেকেও আজকাল নাকি অনেক শিক্ষার্থী শহরের বাইরের কোনো কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পায় সেজন্য একাধিক শিক্ষায়তনে ভর্তির চেষ্টা করে। শিক্ষা, পরীক্ষা, পাস-ফেল নিয়ে কথা অনেক। তার সবকথা তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে যে কথাটি আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত তা হচ্ছে, এই শিক্ষায় অনগ্রসর দরিদ্র দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংস্কারের নামে শিক্ষা ও পরীক্ষাক্ষেত্রে যেন অকারণ নতুন নতুন সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি না করা হয়।